নাস্তিক্যবাদ উৎস ও সমাধান

الإلحاد، أسباب هذه الظاهرة، وطرق علاجها

শাইখ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক

অনুবাদক: মীযান ইবনে হারুন

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الإلحاد، أسباب هذه الظاهرة، وطرق علاجها

الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

ترجمة: ميزان بن هارون

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল নবী-রাসূলগণের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অবিশ্বাস, ধর্মহীনতা আর নাস্তিক্যবাদের অবিরাম ধেয়ে আসা ঝড়ের মুখে পড়ে আজ আমাদের যুবসমাজ দিগ্বিদিকশূন্য। যে জাতি এক সময় গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছে, বিস্তৃত দুনিয়ার দিগ-দিগন্তে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছে, মহান খালিকের মহাপবিত্র রিসালতের আলোকমালা অন্ধকার পৃথিবীর অলিতে-গলিতে পৌঁছে দিয়ে বিশ্ব-মানবতাকে হিদায়াতের রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে, তৎকালীন পৃথিবীর মানবতার ঘাড়ে চেপে বসা সারশূন্য ধর্মগুলোর জের-জুলুম থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদল-ইনসাফের সুশীতল ছায়াতলে এনে আশ্রয় দিয়েছে, শির্কের যিন্দানখানা থেকে আযাদ করে তাওহীদের পেয়ালা মানবতার অধরে তুলে ধরেছে- সেই জাতিই আজ সর্বহারা। বিশ্ব বিজেতা সেই জাতিই আজ বিশ্বের সবচেয়ে ভীতু ও পরাভূত জাতি। সবধরনের জুলুম আর জাহালত আজ সে জাতির সর্বত্র জেঁকে বসেছে। তাদের নতুন প্রজন্ম স্বীয় দীন-ধর্ম আর ঐতিহ্য থেকে সর্বদা পালানোর পথ খুঁজছে। পূর্বপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পাশে ফেলে রেখে কুফর, নাস্তিক্যবাদ আর পৌত্তলিকতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

উম্মাহর এই সর্বনাশা সংকটঘন পরিস্থিতিতে কোনো সচেতন মানুষের পক্ষে কি বসে বসে তামাশা দেখা সম্ভব? আমিও তাই পারিনি। নিজের সকল

দুর্বলতার কথা মনে রেখেই, পাথেয়ের স্বল্পতা আর পথের বন্ধুরতার কথা জেনেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পেয়েছি। কারণ সন্দেহ নেই, আজ গোটা মুসলিম উম্মাহর ভাবী উত্তরাধিকারী যুবসমাজ যেসব আগ্রাসন আর হুমকির সম্মুখীন নাস্তিক্যবাদ রয়েছে এর সামনের কাতারে। আর তাই নিজের ঈমানের দাবি পূরণের লক্ষ্যে নাস্তিক্যবাদের উৎস, কার্যকারণ ও সমাধানের ওপর কয়েকটি পৃষ্ঠা কলম চালনার প্রয়াস পেয়েছি। যদি একজন দিশেহারা পথিকও এর মাধ্যমে দিশা লাভ করেন, একজন আলোক-সন্ধানীও যদি এর মাঝে এতটুকু আলোর রেখা খুঁজে পান- তবেই আমার শ্রম সার্থক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক

কুয়েত, ৭ জুমাদাল আউয়াল ১৪০৩ হিজরী

১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ ঈসায়ী

নাস্তিক্যবাদের পরিচয়

আজ গোটা পৃথিবী নানা সমস্যায় জর্জরিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়জয়কার অবস্থা আর নানা আবিষ্কারের নেশায় একসময় সমগ্র মানবতা কল্পনা করেছিল যে, এবার বুঝি গোটা পৃথিবী সুখের আকাশে ডানা মেলে উড়বে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। বিশ্ব যতই বস্তুগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, ততই সংকট আর মুসীবতের গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে গেছে। আজ আমাদের জীবনে সম্পদের প্রাচুর্য্য এসেছে, পার্থিব বিলাস-ব্যসনের সকল উপকরণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু নেই সুখ ও শান্তির নামের সেই সোনার হরিণ। বরং প্রতিনিয়ত এসব সমস্যা ও সংকটের পরিমাণ বেড়েই চলছে। মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে। ফিতনা ও ফাসাদ আমাদের ওপর রাজত্ব কায়েম করে আছে। স্বার্থপরতা আর চরিত্রহীনতার সর্বত্র জয়জয়কার অবস্থা। জুলুম আর নির্যাতন নিজের সকল রূপ নিয়ে নৃত্য করছে। প্রতি মুহূর্তেই কেউ কেউ না রাজনীতির বলির পাঠা হচ্ছে। ধন-সম্পদের কারণে প্রতিদিনই মরতে হচ্ছে কাউকে না কাউকে। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে গোটা পৃথিবীটাই আজ এসব সমস্যার সম্মুখীন। আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মানবতার পার্থিব ও বস্তুগত উন্নতি এসব সমস্যাকে আদৌ কমাতে পারেনি; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মানুষ যতটাই বস্তুগত উন্নতি লাভ করেছে, এসব সমস্যার প্রকোপ ততটাই বেড়েছে।

আর এসব সমস্যা ও সংকটের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলো নাস্তিক্যবাদ। কিন্তু নাস্তিক্যবাদ কি প্রকৃত অর্থেই কোনো সমস্যার নাম নাকি এটা একই সঙ্গে অন্য কিছু থেকে সৃষ্ট সমস্যা ও সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুও? নাস্তিক্যবাদ সমস্যা বলতে আসলে কী বোঝায়? এর উৎপত্তি ও কার্যকারণ কী? নাস্তিক্যবাদ

সমস্যার ইসলামে কী সমাধান রয়েছে? সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এসব প্রশ্নেরই জবাব খোঁজার চেষ্টা করবো।

নাস্তিক্যবাদ বলতে কী বোঝায়?

নাস্তিক্যবাদ মূলত জগতের সকল দীন ও ধর্মকে অস্বীকারের নাম। এটা আল্লাহর অস্তিত্বে স্বীকার করে না। পরকাল, জান্নাত কিংবা জাহান্নাম কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এর মতে, এই পৃথিবী আর এখানকার পার্থিব জীবনই সবকিছু। এটাই শুরু আবার এটাই শেষ। নাস্তিক্যবাদ মূলত আজ গোটা পৃথিবীর একটি পরিচিত মুখ। উত্তরাধিকারসূত্রে ইউরোপ ও আমেরিকাসহ গোটা পাশ্চাত্য পৃথিবী আল্লাহ ও জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাসী খ্রিস্টধর্ম পেলেও আজ সেখানকার মানুষগুলো কেবল পার্থিব জীবনেই বিশ্বাস করে। খ্রিস্টবাদ আজ সেখানে একটি সেকেলে বিশ্বাসরূপে স্থান লাভ করেছে। গির্জাগুলো হয়ে পড়েছে প্রাচীন ইতিহাস আর ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার যাদুঘর। মানুষের জীবনে এর এতটুকু প্রভাব আজ অবশিষ্ট নেই। অথচ এর বিপরীতে নাস্তিক্যবাদ কখন যে ধীরে ধীরে ইউরোপ ও আমেরিকার সাংবিধানিক ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে তা তারা জানতেও পারেনি। আর সেকারণেই তারা সেই নাস্তিক্যবাদকে কখনো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আবার কখনো ধর্মহীনতা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। বাদবাকি আমাদের মনে রাখতে হবে, বানান আর উচ্চারণে ভিন্নতা থাকলেও এসব শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য কিন্তু এক ও অভিন্ন।

প্রাচ্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র রাশিয়া হলো নাস্তিক্যবাদের লীলাভূমি। কম্যুনিজমের প্রাদুর্ভাবের সেই গোড়া থেকেই রাশিয়া একে বুকে আগলে রেখেছে। সকল সংকট আর প্রতিকূলতা থেকে একে রক্ষা করেছে। কম্যুনিজম ‘গায়েব’ বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে না। এর মতে, পৃথিবীর এই জীবনই সবকিছু। পৃথিবীতে মানুষ যে লড়াই আর সংগ্রাম করে, তাও মূলত এখানে টিকে

থাকারই সংগ্রাম। রাশিয়া ব্যতীত প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশই এতদিন পর্যন্ত হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা কনফুসিয়াস ইত্যাদি ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পশ্চিমা নাস্তিক্যবাদের বাধভাঙা জোয়ারের সামনে শেষ পর্যন্ত সেগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ভেসে গেছে প্রচণ্ড স্রোতের তোড়ে।

গোটা পৃথিবীর এমন সঙ্গিন ও ঝঞ্ঝাঘন অন্ধকার মুহূর্তে আজও ইসলামী বিশ্ব তাওহীদ আর অদৃশ্যে বিশ্বাসের দীপশিখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এর চারপাশে নৃত্য করছে প্রচণ্ড তুফান-ব্যাত্যা। যেন হঠাৎ এসে এক ঝটকায় নিবিয়ে দিবে এই সর্বশেষ প্রদীপটির আলোটুকুও। তাই আমাদেরকে এখনই সতর্ক হতে হবে। এখনই নেমে পড়তে হবে কোমর বেঁধে।

নাস্তিক্যবাদের কারণ:

আজ থেকে মাত্র দুই শ’ বছর আগেও পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদের এতটা ছড়াছড়ি আর বাহাদুরী ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে গত দুইটি শতাব্দী জুড়ে একের পর এক এমন অনেক উপাদান তৈরি হয় যা শেষমেশ এই নাস্তিক্যবাদকে একটি বিস্তৃত ধর্মে পরিণত করে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদের বিস্তারের উপাদান নিয়ে আলোচনা করবো।

এক. ইউরোপীয় গির্জা:

আজ গোটা পৃথিবীতে ধর্মহীনতা, অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদের বিস্তারের জন্য সর্বপ্রথম যাকে দায়ী করা যায় তা হলো ইউরোপীয় খ্রিস্টান গির্জা। ইতিহাসে দেখা যায়, একসময় গোটা ইউরোপ জুড়ে ছিল গির্জার শাসন। পাদরি আর পুরোহিতরাই ছিলেন রাষ্ট্রের অন্যতম সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ। আর এই সুযোগে তারা তখন নিজেদের ইচ্ছেমতো খ্রিস্টধর্মে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন অসংখ্য মিথ্যা, ভোজবাজি আর কুসংস্কার। নিজেদের মন-মগজে আসা অর্থহীন চিন্তা-

ভাবনাকে আসমানী পয়গাম বলে চালিয়ে দিতে তাদের বিবেকে বাধতো না। ঈসা আলাইহিস সালাম-কে মানুষ থেকে মা'বুদের স্তরে পৌঁছে দেওয়া, শূলে প্রাণ বিসর্জন আর গোটা মানবতার 'পাপমুক্তি' ইত্যাদির মতো মস্তিষ্কের অসার কল্পনাগুলোকে তারা ধর্মের মূলনীতিতে রূপ দিয়েছিল। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি এই বিশ্ব, পৃথিবী ও জীবন সম্পর্কেও তারা বিভিন্ন অলীক ধারণা পোষণ করত ও মানুষকে তা জানাত। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ আসে তখন ইউরোপের মাটিতে জন্ম নিতে থাকেন অসংখ্য বিজ্ঞানীগণ। তারা পৃথিবীর রহস্য ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ প্রকৃত তথ্য মানুষকে জানাতে শুরু করেন, ঠিক তখনোই গির্জার ন্তঅন্তরালে লুকায়িত খ্রিস্টধর্মের ধ্বজাধারীরা আদাজল খেয়ে তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামে। গির্জার পুরনো মতামতকে বাদ দিয়ে যারা নতুন নতুন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ধারণাকে সত্যায়ন করেছিল তাদেরকে অবিশ্বাসী, ধর্মদ্রোহী আর স্তিনাস্তিক বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীকে সেসব তথাকথিত ধর্মদ্রোহীকে ধরে ধরে হত্যা ও আগুনে পোড়াতে সুপারিশ করে। এভাবেই কেবল গির্জার মতামতের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে সেসময় অগণিত-অসংখ্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানীকে হারায় ইউরোপের মাটি ও মানুষ।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই নব-জাগরণের প্রবল স্রোত বালুর বাধ দিয়ে গির্জা তাকে আটকে রাখতে পারেনি। বিজ্ঞানীগণ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য ও আবিষ্কার মানুষের সামনে পেশ করতে থাকেন আর গির্জার পুরোহিতরা একের পর এক হোঁচট খেতে থাকেন। এভাবে এক পর্যায়ে এসে গির্জার গোমর মানুষের সামনে ফাঁস হয়ে পড়ে। ইউরোপের মাটিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীগণ উঠে আসেন নেতৃত্বের আসনে। মানুষের মাঝে এক নবতর জাগরণ নামে। তারা সকলে মিলে একযোগে হামলে পড়ে গির্জা ও গির্জার অধিবাসীদের ওপর।

আবিষ্কার করে গির্জার দেওয়ালের ভেতরের এক লজ্জাকর দুনিয়া। যেখানে ভালো মানুষের পোশাকের ভেতরে লুকায়িত ছিল পাশবিক চরিত্রের পুরোহিত নামধারী কতগুলো মানুষ। তাদের অশ্লীলতা আর দুশ্চরিত্র দেখে সাধারণ মানুষ ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হয়। সিদ্ধান্ত হয়- না এই গির্জার অধীনে আর থাকা যাবে না। এসব লোকদের নেতৃত্ব থেকে আমাদের অবশ্যই আযাদ হতে হবে। আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কর আর চাঁদাবাজিরও অবসান ঘটাতে হবে। এভাবেই ইউরোপের মানুষগুলো এক ধর্মের দোষ সব ধর্মের ওপর চাপিয়ে দেয়। একটি বিশেষ ধর্মকে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে সব ধর্মকেই ছুঁড়ে ফেলে। সকল নবী ও রাসূলই তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। যেকোনো অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আহ্বানকেই তারা মস্তিষ্কের ঊষর কল্পনা আখ্যায়িত করে নিক্ষেপ করে আস্তকুঁড়ে। ধর্ম পরিণত হয় তাদের প্রধান দুশমনে। আর এটাই ছিল মূলত গোটা বিশ্ব নাস্তিক্যবাদের প্রথম তুফান।

দুই. পুঁজিবাদী বিশ্বের অত্যাচার:

গির্জার প্রভাব থেকে ইউরোপের মানুষগণ তখনও পুরোপুরি মুক্তি লাভ না করলেও বাষ্পের শক্তি আর যন্ত্র আবিষ্কারের ধারাবাহিকতা শুরু হতে না হতেই তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বদলে যেতে থাকে। মানুষ কৃষিকাজ বাদ দিয়ে শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ন্তসামন্তপ্রভু ও জায়গীরদাররা তাদের বাপ-দাদার পুরনো ঐতিহ্য ছেড়ে দিয়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে অনেকটা রাতারাতিই তারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়। সেসব শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের তারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে থাকে। তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় নানারকম জুলুম-অত্যাচার আর শোষণের খড়্গ। ফলে জালেম পুঁজিবাদী আর মজলুম শ্রমিক নামে মানুষ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অত্যাচারের এই নতুন পন্থা উদ্ভাবনের ফলে, পাশাপাশি ধর্মের

পতাকাবাহীদের অত্যাচারী শ্রেণীদের সহায়তা কিংবা জুলুম-অত্যাচারের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষোভ আর ঘৃণার আগুন জ্বালায়। এক পর্যায়ে মানুষ আল্লাহর স্তিঅস্তিত্বে সন্দেহ করতে শুরু করে। ধর্মকে তারা জুলুমের হাতিয়ার কিংবা নিদেনপক্ষ সহায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করে। ধর্ম তাদের পার্থিব সমস্যার কোনো সমাধান দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম- এমন বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। আর এভাবেই মানুষের জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব-বলয় ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে। ফলে মানুষ নিজেই নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ খুঁজতে থাকে। সত্যি কথা কি- এই ক্ষেত্রেও ইউরোপের গির্জা মানুষের কোনো সহায়তা করতে পারে নি।

তিন. নাস্তিক্যবাদী অর্থনীতির গোড়াপত্তন:

নাস্তিক্যবাদের তুফান বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার তৃতীয় উপকরণ ছিল নাস্তিক্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন। আর এর মাঝে সবার আগে যে নামটি চলে আসে তা হলো ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত জার্মান খ্রিস্টান (পরবর্তীতে নাস্তিক) কাল মার্কসের উদ্ভাবিত কম্যুনিজম। যদিও মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যই কম্যুনিজমের উৎপত্তি হয়েছিল এবং পুঁজিবাদী দুনিয়া ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধন-সম্পত্তির ধারার বিলোপ সাধন করে সকল মানুষের সমতার ওপর ভিত্তি করে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার শ্লোগান নিয়ে এটা অস্তিত্বে এসেছিল; কিন্তু এর হর্তাকর্তারা ধীরে ধীরে একে ধর্মীয় পোশাক পরাতে শুরু করেন। ফলে সেখানে আস্তে আস্তে অর্থনীতির সঙ্গে দূরতম সংশ্লিষ্টতা নেই এমন বহু বিষয়েরও অনুপ্রবেশ ঘটে। এক পর্যায়ে তারা ধারণা দিতে শুরু করেন- মানুষের জীবনটা কেবল পার্থিব জগতের জন্যই। প্রভু, পরকাল কিংবা আত্মা বলতে আসলে কিছু নেই। আর তাই সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের আগ্রহ

আর আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র কেবল পার্থিব দুনিয়ার উন্নতি-অগ্রগতি। পরবর্তীতে মানুষকে আরও জানানো হয় যে, জগতের ধর্মগুলো মূলত গরীবকে শোষণের জন্য ধনীদের আবিষ্কৃত হাতিয়ারমাত্র। আমানত, সচ্চরিত্র ইত্যাদি আখলাকগুলো পুঁজিবাদী স্বার্থকে রক্ষার জন্যই চতুর মস্তিষ্কের চিন্তার প্রসবমাত্র। আর এভাবেই সাম্যবাদীদের বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে জগতের সকল নবী-রাসূলের দুশমনির ওপর। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে- সমাজের সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে জুলুম-নির্যাতনের পথ সুগম করার জন্যই আম্বিয়ায়ে কিরাম জগতে এসব ধর্মের প্রচার করেছিলেন। আর এভাবেই অর্থনৈতিক এই বিশ্বাসটি এক পর্যায়ে সব ধর্মের দুশমন হয়ে নাস্তিক্যবাদের এক নতুন তুফানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আরও আগে বেড়ে বলা যায়, কম্যুনিজমই ছিল সম্ভবত নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী তুফান। কারণ কম্যুনিজমের মূল শ্লোগান আর দর্শন ছিল সমাজের সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বাহ্যিকভাবে যা ছিল ইনসাফপূর্ণ ও মানবতার জন্য পরম উপকারী একটি দর্শন। আর যেহেতু সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিল দরিদ্র ও নিপীড়িত-নিষ্পেষিত সেহেতু নিজেদের মঙ্গল ও স্বার্থের কথা চিন্তা করে সাধারণ মানুষরা হৃদয়ের দুয়ার খুলে একে স্বাগত জানায়। এটা আসন গেড়ে বসে তাদের মনের মণিকোঠায়। বস্তুত কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়; একটি ধর্মবিশ্বাস হিসেবেও এটি স্থান পেয়ে যায় তাদের মস্তিষ্কের গভীরে।

আর এভাবেই নতুন একটি অর্থনৈতিক ধারার ছদ্মাবরণে নাস্তিক্যবাদ পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। পরবর্তীতে রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য ও তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগ্রহণ ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারা প্রকাশ্যে ধর্মের গলা কাটতে শুরু করে। নাস্তিক্যবাদ অলি-

গলি ছেড়ে এবার রাজপথে নেমে হুক্কাহুয়া করতে থাকে। ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এই প্রলয়ংকরী তুফান।

কম্যুনিজমের বিশ্বাস ছিল, গোটা পৃথিবী একসময় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর বিশ্বাসের কাছে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করবে। আর সেকারণে এটা শুধু দাওয়াতের ভেতরেই তার কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রাখেনি; গোটা বিশ্বে এই আদর্শ ছড়িয়ে দিতে এক পর্যায়ে বিপ্লব আর রক্তাক্ত সহিংসতার পথ বেছে নেয়। ফলে দ্রুত গোটা বিশ্বে এই আদর্শিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতি নিজের অজান্তেই নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল চীনে ও রাশিয়ার সীমানার ভেতরের বিভিন্ন ইসলামী প্রজাতন্ত্রে। আজও মার্কসীয় বিশ্বাসের প্রজ্জ্বলিত নাস্তিক্যবাদের এই আগুন গোটা বিশ্বে দ্রুতদ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি ইসলামের দুর্গ হিসেবে খ্যাত আরব দুনিয়ায়ও মার্কসীয় মতাদর্শ একের পর এক হানা দিয়ে যাচ্ছে।

চার. বস্তুবাদী শক্তির সঙ্গে নাস্তিক্যবাদের মিলন:

আল্লাহর অস্তিত্বে অস্বীকার আর নাস্তিক্যবাদের দিকে ছুটে যেতে মানুষকে উদ্বুদ্ধকারী আরেকটি উপাদান ছিল নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে বস্তুবাদী শক্তির সম্মিলন। কারণ মানুষ দেখলো, যেদিন থেকে গির্জা ও গির্জার বিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে আযাদ করতে পেরেছে, সেদিন থেকেই ইউরোপ তাদের ধারণা মতে জীবনের সব রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে আর আরোহণ করেছে বস্তুবাদী শক্তি ও উন্নতি-অগ্রগতির সানুদেশে। একইভাবে রাশিয়াও নিজেকে নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার পরপরই রাতারাতি পরিণত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে। তারা আরও দেখলো, যেসব রাষ্ট্র অদ্যাবধি ধর্মকে আঁকড়ে ধরে আছে, বস্তুবাদী শক্তি ও শিল্প ইত্যাদির দিক থেকে সেগুলো অন্যদের তুলনায় যোজন যোজন পেছনে পড়ে আছে। আর এভাবেই তাদের

মনে বদ্ধমূল গভীর বিশ্বাস গড়ে ওঠে: নাস্তিক্যবাদই হলো শক্তি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল চাবিকাঠি। ধর্মের নামই হলো মূর্খতা আর পশ্চাৎপদতা। পাশাপাশি বস্তুবাদী বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের ফলে যেহেতু মানব জীবন অধিকাংশ ক্ষত্রেই সহজতর হয়ে পড়েছিল এবং মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখময় করার ক্ষেত্রে এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই যে কোনো মানুষের চোখে ধরা পড়ার মতো ছিল, সে কারণে সহজাতভাবেই মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই এক সময় বসিয়ে দেয় মা'বুদের আসনে। কারণ তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এই মা'বুদই পারবে তাদের পার্থিব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে। আরও আগে বেড়ে, এই নতুন মা'বুদই তাদের অন্য গ্রহে যাওয়ারও স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। এভাবেই নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে নতুন নতুন আবিষ্কার আর বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলন মানুষের ভেতরে এই প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, বিজ্ঞান হলো নাস্তিক্যবাদের সহজাত ফলাফল। আর এভাবেই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের ছদ্মাবরণে এই তুফান মানুষের মনের দরিয়ায় ঝড় বইয়ে দিয়ে তাকে অশান্ত ও সংক্ষুব্ধ করে তোলে।

পাঁচ. ইউরোপীয় ঝড়ের মুখে ইসলামী দুনিয়া:

বস্তুবাদী শক্তি আর ক্ষমতার মালিক হয়ে ইউরোপ যখন তার মাটিতে অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে, তখন এসব কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বাজার ও কাঁচামালের সন্ধানে তারা গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেসব ভূখণ্ড যেহেতু অল্প পরিশ্রমে কিংবা সম্পূর্ণ মুফতে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধিতে সর্বদা তৎপর ছিল, যার ফলে সেটা অর্জনের জন্য তারা তাদের সামরিক শক্তি ব্যয় করা শুরু করে। অপরদিকে কপাল খারাপ ছিল ইসলামী দুনিয়ার। এটা তখন দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে

দুর্বলতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। পরিণতিতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক হামলার সামনে এটা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ফলে অস্ত্রের লড়াইয়ে ইউরোপের সামনে আত্মসমর্পণ করে বসলো ইসলামী দুনিয়া। সামরিক পরাজয়ের ধারাবাহিকতা এক সময় আকীদা ও বিশ্বাসের পরাজয় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকলো। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক নাস্তিকদের প্রচণ্ড ঝড়ের সামনে ইসলামী দুনিয়ার আকীদার ভীত নড়বড়ে হয়ে ধ্বসে পড়ার উপক্রম হলো। এক পর্যায়ে ইসলামী উম্মাহ নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্য পেছনে ছুঁড়ে ফেলে ইউরোপীয় উপনিবেশের অনুসরণ করতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে তাদের ভেতরে অনুপ্রবেশ ঘটলো নাস্তিক্যবাদী এই বিশ্বাসের যে, ধর্মকে পরিত্যাগ করেই ইউরোপ উন্নতির সানুদেশে পৌঁছে গেছে। গোটা বিশ্বব্যাপী নাস্তিক্যবাদের বিস্তারের ক্ষেত্রে ইসলামী দুনিয়ার এই স্খলনও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

ছয়. নয়া যিন্দিগি ও সভ্যতার আড়ম্বর:

পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ দুনিয়ার সামনে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস আর প্রাচুর্যের এক নয়া দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। চোখ ধাঁধানো বাড়ি-গাড়ি, যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্ময়কর বিকাশ আর বিলাস-ব্যসনের সকল উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, পোশাক-আশাকের ঔজ্জ্বল্য, উন্নত মানের খাদ্যদ্রব্যের আড়ম্বর আর জীবনের সকল ভোগ-সামগ্রীর ঘটা মানুষকে তাদের পুরনো পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবীতে নিয়ে গেলো, যেখানে ভোগের সাগরে বুঁদ হয়ে থাকা ছাড়া জীবনের আর কোনো মানে ছিল না তাদের কাছে।

সন্দেহ নেই, জগতের ধর্মগুলো যেই মূলনীতির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল নতুন জীবনের এই সবকিছুই ছিল ঠিক তার বিপরীত মেরুতে। কারণ ধর্ম স্বভাবতই মানুষকে অপচয় থেকে নিষেধ করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের দীক্ষা দেয়। মদ, ব্যভিচার ও নগ্নতাসহ

সকল হারাম ও অন্যায়ের পথ বর্জনের নির্দেশ দেয়। আর এতেই মানুষ ধর্মকে ভুল বুঝলো। দীন ও ধর্মের হিকমত ও রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ ধর্মের এই নীতিমালাকে মনে করতে লাগলো তাদের স্বাধীনতার পথের কাঁটা হিসেবে। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মালো, ধর্ম তাদের স্বাধীনতার পায়ে শেকল পরিয়ে দিতে চায়। তাদের ভোগ-বিলাসের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে চায়। ফলে এভাবে ধর্মের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা ও বিরাগ আরও বেড়ে গেল। অধিকন্তু, ধর্মের পথে আহ্বানকারীরাও তাদের দুশমনে পরিণত হলেন। যে ব্যক্তিই জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে তাদের জান্নাতের দিকে উদ্বুদ্ধ করতো তাকেই তারা ঘৃণা করতে শুরু করলো। আর এভাবেই দিনে দিনে ধর্ম-বিশ্বাস মানুষের মধ্য থেকে বনবাসে চলে গেলো। মানুষের মনের আসনটি দখল করে নিলো নাস্তিক্যবাদ।

সাত. বিরামহীন জীবনের নাগরদোলা :

পশ্চিমা সভ্যতা জীবনকে উপভোগের যেই দুয়ার পৃথিবীর সামনে খুলে দিয়েছিল তাতে গোটা মানব জাতি উন্মাদ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। জীবনের ভোগ-বিলাসের হাজারও উপায়-উপকরণ দেখে মানুষের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হলো। সেগুলোর ভোগ-সম্ভোগের পথে দৌড়াতে গিয়ে একসময় মানুষ তার চারপাশের সবকিছু বরং একদিন নিজেকেও ভুলে গেলো। জীবনকে সহজ করার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলো। আর এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে মানুষ তার পরিশ্রম আর কর্মের পরিধিও আরও বিস্তৃত করলো। একসময় পুরুষের একার শ্রম পরিবারের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হলে একসময় অন্তঃপূরের নারীও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে নেমে এলো। জীবনের প্রলুব্ধকর হাতছানিতে সাড়া দিয়ে ভোগের সাগরে বুঁদ হয়ে থাকার জন্য প্রয়োজন হলো আরও অর্থ ও

প্রাচুর্য্যের। ফলে মানুষ আরও বাড়িয়ে দিলো তার কাজের গতি। এভাবে মানুষ একসময় মেশিনে পরিণত হলো। জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যার কাজই দিন-রাত কেবল ঘুরতে থাকা। ফলে একদিন মানুষ তার নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সময়টুকুও হারিয়ে ফেললো। নিজের স্থান ও অবস্থান, নিজের পরিচয় ও গন্তব্য এসব নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগই তার রইলো না। ভোর হতেই সে কাজে নেমে যায়। দিনের শেষ প্রান্তে কাজের শেষে চলে যায় মনের চাহিদা মেটাতে ভোগ-বিলাসের সন্ধানে। এটাই পরিণত হয় তার প্রাত্যহিক রুটিনে। ফলে ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কথাও মানুষ একসময় ভুলে যায়। মানুষের জীবনে স্বাভাবিকভাবে তৈরি সহজাত কিছু প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথাও তার মনে পড়ে না। তার ভাবনাতেও কোনো দিন আসে না: কে এই পৃথিবীর স্রষ্টা? আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আর কেনই বা সৃষ্টি করেছেন? আমাদের গন্তব্য কোথায়? এই পৃথিবীর কোনো শুরু বা শেষ আছে কি? মানুষের মাঝে ধনী-গরীব, জালেম-মজলুম আর হত্যাকারী ও নিহতের এই শ্রেণীভেদ কেন? সত্যি কথা হলো, জীবন-চক্রের অবিরাম ঘূর্ণন তাকে এগুলোর জবাব খোঁজার অবসরটুকুও দেয়নি।

এই ছিল নাস্তিক্যবাদের প্রাদুর্ভাব ও দুনিয়াব্যাপী তার ভয়ংকর সয়লাবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এবার আমরা দেখবো, নাস্তিক্যবাদের বিকাশ ও বিস্তারের ফলে আমাদের সমকালীন জীবনে কী প্রভাব পড়েছে? এটা আমাদের জীবনের জন্য কোন ধরনের সর্বনাশ ডেকে এনেছে?

নাস্তিক্যবাদের বিকাশ ও বিস্তারের প্রভাব

এক. মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অনিঃশেষ অস্থিরতা:

নাস্তিক্যবাদ একজন মানুষের জীবনে যেসব অভিশাপ আর সর্বনাশ ডেকে আনে তার ভেতরে সবার প্রথমেই আসে মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পেরেশানী, মনের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা। প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে সহজাতভাবে কিছু প্রশ্ন জাগবে এটাই স্বাভাবিক? কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আর আমি যাব-ই বা কোথায়? এটা ঠিক যে যান্ত্রিক জীবনের অবিরাম ঘূর্ণন মানুষকে অধিকাংশ সময়ই এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সময় দেয় না। কিন্তু তারপরেও কখনো কখনো মানুষ জীবনে চলার পথে ধাক্কা খেয়ে নিজের অজান্তেই এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে থাকে। বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ আর রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কিংবা বন্ধু-বান্ধব ও কাছের মানুষ হারিয়ে হঠাৎ মানুষের মনখানি ব্যাকুল ও উদাস হয়ে ওঠে। এভাবে ছন্দময় জীবনে হঠাৎ যখন ছন্দপতন ঘটে, তখন মানুষ নিজের অস্তিত্ব ও গন্তব্য নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর স্তিঅস্তিত্বে অস্বীকারের তথাকথিত নড়বড়ে ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা নাস্তিক্যবাদ যেহেতু এসব প্রশ্ন ও তার জবাব সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ, সেহেতু এটা কোনো দিনও মানুষকে এসব প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে সক্ষম হয় না। ফলে জীবনের এসব প্রশ্ন মানুষের মনে ধাঁধা হয়ে ভয়-ভীতি ও পেরেশানীর জন্ম দেয়। এটা সর্বদাই তার বিবেককে যন্ত্রণার আগুনে জ্বালাতে থাকে।

একসময় পৃথিবীর মানুষ দৈনন্দিন কাজ-কর্মের বিরতিতে আকাশ-পাহাড়, সাগর-নদী আর বন-বনানী নিয়ে মেতে উঠতো। ফুলের বাগান আর ফুলের সঙ্গে সখ্যতা গড়তো। বনের পাখির সঙ্গে গান গাইতো। প্রাকৃতিক এসব সৌন্দর্য কখনো কখনো তাকে নিজ স্রষ্টা আর রবের পরিচয় পেতে সাহায্য করতো। এগুলোর পরশ পেয়ে এক সময় সে আপন প্রভুর সান্নিধ্যের শিহরণে ধন্য হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ মানুষের পুরো সমাজ ও আশপাশের

সবকিছুই যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়েছে। আজ মানুষ তার চারপাশের যেদিকেই তাকায় আকাশচুম্বী দালান-কোঠা, যানবাহনের কান-ফাটা চেঁচামেচি ছাড়া কিছুই দেখতে ও শুনতে পায় না। সড়কের চোখ ধাঁধানো আলোকমালা তার মনের আভাটুকু কখন কেড়ে নিয়ে গেছে তা সে নিজেও জানে না। আর এভাবেই সে তার রব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রাকৃতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তার পেরেশানী কেবল বাড়তেই থাকে।

প্রাচীন কালের সমাজ ব্যবস্থায়ও ছিল সহজতা আর সারল্যের এক অনুপম সৌন্দর্যের শোভা। সেখানে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা ছিল সুন্দর সমাজের একটি অনস্বীকার্য উপাদান। বিপদ-আপদে একে অপরের কাছে ছুটে আসা, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সুখ ও দুঃখকে পরস্পর ভাগাভাগি করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেঁচে থাকা ছিল সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্র। কিন্তু আধুনিক সমাজে মানুষ নিজের দুঃখের কাহিনী শোনানোর জন্য কাউকে খুঁজে পায় না। নিজের অস্থিরতার কথাগুলো বলার জন্য কোনো সুহৃদ দেখতে পায় না। জীবন পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে কেউ যে তাকে হাত ধরে উঠাবে এমন কোনো আশার আলো তার চোখে পড়ে না। আর সেকারণেই ভবিষ্যৎ নিয়ে তার এতটা ভয়, এতটা অনাস্থা। সেই ধারাবাহিকতায় সমাজের সবগুলো মানুষ কেবল নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন-নিয়ে দুই হাত ভরে ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এখানে বোঝার চেষ্টা করুন, যদি এই অবস্থায় মানুষ আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করতো, তবে সে ভবিষ্যতের জন্য এতটা পেরেশান আর ব্যাকুল হয়ে উঠতো না। কারণ সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে স্বাভাবিক গতিতেই পথ চলতো। আর এই বিশাল সমস্যার সমাধানও হয়ে যেতো অতি সহজে। কিন্তু নাস্তিক্যবাদ এই সমস্যার কোনো সমাধানই দিতে পারেনি। কারণ এর মতে,

মানুষই তো তার সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং এসব সমস্যার সমাধানও তাকেই বের করতে হবে। আর এভাবেই সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই ব্যক্তিচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে চরম স্বার্থপর।

দুই. ব্যক্তিচিন্তা ও স্বার্থপরতা:

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অজানা ভীতি ও শঙ্কা আর মানসিক পেরেশানী ও অস্থিরতার অনিবার্য পরিণতি এই যে, সমাজের মানুষগুলো সতত আত্মচিন্তামগ্ন ও চরম স্বার্থপর হয়ে পড়বে। অন্যের চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে সদা-সর্বদা নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তাই হবে তার দিন-রাতের সাধনা। কারণ ধর্ম মানুষকে সব সময় অন্যের জন্য নিজের সাধ্যমতো ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর রিযামন্দি লাভ করতে হলে পরের কল্যাণে পূর্ণ নিবেদিত হতে হবে-এমন দীক্ষা দেয়। কিন্তু অপরের কল্যাণকামিতা, দয়া ও মমতা প্রদর্শন আর পরহিতব্রতের উৎসমূল সেই ধর্মই যখন মানুষের জীবন থেকে বিদায় নেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার জায়গা এসে দখল করে ব্যক্তিচিন্তা ও আত্মপরায়ণতা। সেকারণেই নাস্তিক্যবাদী সমাজে আমরা দেখতে পাই, সেখানে কেউ কারও সাহায্যে এগিয়ে আসে না। দরিদ্র ও গরীব মানুষের প্রতি কেউ সহমর্মিতা ও মমত্ববোধ দেখায় না। এভাবে একসময় স্বার্থপরায়ণতার পরিধি বাড়তে থাকে। মানুষ স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি স্ত্রী-পরিবার ও বাবা-মাকেও ভুলে যায়। পরের মঙ্গলের জন্য সে কেবল তখনই চিন্তা করে, যখন সেটা তার স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রেও কাজে আসে। স্বার্থপরতার এই সয়লাবের ক্ষেত্রে মানুষকে আরও সামনে ঠেলে দেয় পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি তার বিশ্বাস ও চিন্তাধারা। নাস্তিক্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু জীবনের সবধরনের বিলাস-ব্যসনকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, সে কারণে মানুষ সেসব ভোগে

নিজেকে জড়িয়ে নিতে স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে আর কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করে না। কারণ সে খুব ভালো করেই জানে, পরের জন্য চিন্তা এ ক্ষেত্রে তার কোনোই উপকারে আসবে না। আর এভাবেই গোটা বিশ্বে এ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের চেয়েও দ্রুত গতিতে।

তিন. জীবনের লাগামহীনতা ও অপরাধ-প্রবণতা

নাস্তিক্যবাদ মানুষের মন ও মননকে সঠিক ও সুস্থভাবে প্রতিপালন করে না। তাকে ভালো ও সৌন্দর্যের দীক্ষা দেয় না। কোনো দিনও তাকে তার রবের ভয় দেখায় না, যিনি নিরন্তর তাকে দেখে চলেছেন। তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত রয়েছেন। একারণেই একজন নাস্তিক রূঢ়-স্বভাব ও অনুভূতিহীন হয়ে বেড়ে ওঠে। ফলে তার গোটা জীবনটা হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণশূন্য ও লাগামহীন। অন্যায় ও অপরাধ থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখার মতো কোনো বস্তু তার ভেতরে থাকে না। ন্যায় ও সততার প্রতি তাকে কোনো কিছু উদ্বুদ্ধ করে না। বরং এর বিপরীতে নাস্তিক্যবাদ তার কানে কানে প্ররোচিত করে যে, এ পৃথিবীতে তুমি এভাবেই হঠাৎ করে চলে এসেছো। তোমাকে কেউ সৃষ্টি করেনি অথবা তুমি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছো। আর পৃথিবীতে তুমিও লাখো প্রাণীর মতো একটি প্রাণী। ফলে তার ভেতরে ধীরে ধীরে জন্তু-জানোয়ারের গুণাবলী বেড়ে উঠতে থাকে। ওভাবেই সে নিজেকে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু কখনো কখনো যদি সমাজ কিংবা পরিস্থিতি তার স্বার্থসিদ্ধির পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সেই কাঁটা উপড়ে ফেলতে বিভিন্ন কলা-কৌশল কিংবা জোর-জবরদস্তিতার আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাকে পূর্ণরূপে লাগাম পরানোর মতো কেউই থাকে না। কারণ সে কোনো রবকে ভয় করে না। কারও কাছে জবাবদিহির কোনো চিন্তা করে না।

তাহলে তার আর দুশ্চিন্তার জায়গাটা কোথায়? হ্যাঁ, কখনো কখনো সামাজিক নিয়ম-নীতি কিংবা মানবীয় আইন-কানুন তার স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন এমন যে কারও কাছে স্পষ্ট যে, সেই প্রতিকূলতা দূর করতে তার খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় না। আবার কখনো কখনো মানবিক প্রবৃত্তি কিংবা মানুষের সহজাত বিবেকবোধ তার অনুভূতিতে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে, ভেতর হতে তাকে অপরাধ থেকে ফেরানোর জন্য কখনো কখনো ডাক দিয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে এগুলো কি তাকে তার পথ থেকে ফিরাতে পারে? আসল কথা হলো, নিরন্তর ধাবমান জীবন চাকার গড়গড় ঘূর্ণনের মাঝে বিবেকবোধ আর হৃদয়ের গভীর থেকে ভেসে আসা অনুচ্চকিত সেই আওয়াজ নিমেষেই বাতাসে মিলিয়ে যায়।

মানব জীবনে নাস্তিক্যবাদের এই প্রভাবটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কারণ আজ আমাদের গোটা পৃথিবীটা অপরাধ আর অন্যায়ে ভরপুর একটি পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটিদিনই সংবাদপত্র আর রেডিও-টিভিতে জঘন্যতম অন্যায়-অপরাধের এমনসব খবর প্রচারিত হচ্ছে, যা ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। চরম সহিংসতা, বিকৃত যৌনাচার, মানুষের রক্তপান, অপরকে নির্যাতনের মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণ আর স্বগোত্রীয় মানুষের কলজে-ছেঁড়া আর্তনাদের সামনে বিকৃত অট্টহাসির মতো পশুত্বের অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ আজকের মানব সমাজের প্রতিদিনকার স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুরি-ডাকাতি আর হত্যা-লুণ্ঠন দিনে দিনে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্কের এক রাতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ঘটনার কথাই ধরুন। সকালে পৃথিবী আবিষ্কার করলো, হাজার হাজার ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক আর দোকান-পাট সম্পূর্ণ লুট হয়ে গেছে। আর এই সংঘবদ্ধ চুরিতে সমাজের সব

বয়সের সব ধরনের পেশার মানুষ যুক্ত ছিল। মোটকথা- যে যেখানে যা কিছু পেয়েছে সেটাই নিয়ে গেছে। এমনকি পুলিশ বাহিনী- যাদেরকে মানুষের জান-মাল সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে- সেই রক্ষকরাও ভক্ষকের ভূমিকা নিয়ে ইচ্ছেমতো এই চুরির উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কোনোভাবে সপ্তাহব্যাপী এখানে বিদ্যুৎ না থাকতো, আর সেনাবাহিনীও এখানে কোনো রকমের ভূমিকা না নিতো, তবে এক সপ্তাহ পরে গোটা শহরসুদ্ধ লুট হয়ে যেতো। সুতরাং যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট ইত্যাদিতে কিংবা যুদ্ধঘন পরিস্থিতিতে এই সমাজের একে অপরকে খেয়েও ফেলে- তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? মূলত এসবকিছুই নাস্তিক্যবাদের অনিবার্য ফলাফল।

চার. পারিবারিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি:

নাস্তিক্যবাদ মানুষের সামাজিক জীবনে ধ্বংসের কুঠার হয়ে গোড়া কেটে দিয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরত্ব কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিজীবনেই প্রভাব ফেলে না; বরং স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রভাব বিস্তৃত হয় তার সামাজিক জীবনে এবং সেটাকে গুঁড়িয়ে দেয়। একটি সুন্দর মানব সমাজের অবকাঠামো তৈরি হওয়ার জন্য শর্ত হলো সেখানে লাগানো ইটগুলো হতে হবে সুন্দর ও ভালো। যদি ভিত্তিমূলই ভালো না হয়, ভবনের মূল উপকরণই যদি সুস্থিত ও মজবুত না হয় আর পরবর্তীতে সেই ভবন গড়ে উঠতে না উঠতেই কাত হয়ে পড়ে, তবে তাতে বিস্ময়ের কী থাকে?

মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে পরিবার। আর সেই কারণে যখন সুন্দর ও সুস্থ মানবতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পারিবারিক বন্ধনও

অসুস্থ ও অসুন্দর হয়ে পড়ে। একটি পরিবারের প্রধান পুরুষ স্বামীর স্বভাব নষ্ট হলে সেই নষ্টামি স্ত্রী পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সন্তানদের প্রতি গড়ানোই স্বাভাবিক। একইভাবে পরিবারের স্ত্রীর ভেতর যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, নিজের কাজকর্মে তাকে মনে না রাখে, তবে এর প্রভাব অনিবার্যভাবেই স্বামী-সন্তানদের ওপর পড়ে। আর এভাবেই একজন মন্দ মানুষের কারণে একসময় গোটা পরিবার নষ্ট হয়ে পড়ে। নাস্তিক্যবাদ ঠিক সেই ধ্বংসের কাজটাই করেছে নিপুণভাবে। আর সে কারণেই বর্তমান নাস্তিক্যবাদী সমাজে আমরা এমন কোনো পরিবারের সন্ধান পাই না যার সবগুলো অঙ্গ সঠিক ও সুস্থভাবে কাজ করছে। যেই পরিবারের সকল সদস্যের মাঝে সুন্দর ও সুষম ভারসাম্য রয়েছে। আর যখন সুষম পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে একটি অসুস্থ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তাৎপর্যও হারিয়ে যায়। তাৎপর্যহীন সেই সম্পর্কের ভেতরে তখন থাকে কেবল স্বার্থসিদ্ধি আর ভোগ-সম্ভোগের গরজ। সেখানে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা, নিখাঁদ ভালোবাসা কিংবা ত্যাগ ও কুরবানীর ছিঁটেফোঁটাও থাকে না। পরিবারের কল্যাণের জন্য একজন স্বামী কিংবা বাবা যে নিজের সকল স্বার্থ ও সাধকে কুরবানী দিয়ে দিতে পারেন, একজন নিষ্ঠাবান স্ত্রী যে কখনো জীবনের চক্রাবর্তে কেবল ভালোবাসার তাগিদে একজন হতদরিদ্র, অসুস্থ ও সাধারণ স্বামীর ঘর করতে পারেন, সয়ে যেতে পারেন সন্তানদের প্রতিপালনসহ জীবন-যুদ্ধের সবধরনের সংগ্রাম ও সাধনা- এগুলো একটি নাস্তিক্যবাদী পরিবারে কল্পনাও করা যায় না। পরকালের হিসাব-নিকাশ আর ভালো-মন্দ পরিণতিতে অবিশ্বাসী একটি পরিবারের ভেতরে কখনো ত্যাগ-তিতিক্ষার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ তখন কুরবানী করে কী লাভ- এই প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় না। একইভাবে সন্তানদের কথাও ধরুন। আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাসী একজন সন্তান জানে, তার পিতা-মাতার

বার্ধক্য কিংবা দুরবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সে আদিষ্ট। কিন্তু সে যদি আল্লাহ তাআলার ওপরই বিশ্বাস না করে, তবে এত কষ্ট সে কোনো দিনও করতে যাবে না। ব্যক্তিস্বার্থ কাজ না করলে মাতা-পিতার দিকে ফিরেও তাকাবে না। এভাবেই নাস্তিক্যবাদের প্রাদুর্ভাবের মধ্য দিয়ে পরিবারিক বন্ধনে মূল যেই সুতোখানি থাকে সেটাই ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে।

নাস্তিক্যবাদ পারিবারিক বন্ধনের এতখানি ক্ষতি করেও নিরস্ত থাকেনি; বরং এটা আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে সর্বনাশের এমন সবদিক উন্মোচিত করেছে যা ভাবতেও অবাক লাগে। জীবনের ভোগ-বিলাস পূর্ণ মাত্রায় আস্বাদন করতে গিয়ে, কামচরিত্র পূরণের পথে দৌড়াতে গিয়ে একজন অবিশ্বাসী মানুষের কাছে বৈবাহিক ও পারিবারিক বন্ধন ধরে রাখার বিষয়টিও বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়। কখনো কখনো তাই পুরুষরা ভাবতে থাকে যে, পরিবারের সবগুলো সন্তান তার ঔরসেই যে হয়েছে এমনটি নাও হতে পারে। একইভাবে পরিবারের সন্তানরা ভাবতে থাকে, তাদের সবাই একজন পিতার ঔরসে নাও হতে পারে। আর এভাবেই একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবারের সদস্যদের এক ও অভিন্নপ্রাণ হওয়ার নান্দনিক অনুভূতি সবার মাঝখান থেকে হারিয়ে যায়। শারীরিক ভোগ-সম্ভোগের সুযোগ পেলেও, দৈহিক সুখে শিহরিত হয়ে উঠলেও তারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকে মনের সুখ আর হৃদয়ের প্রশান্তি থেকে। কারণ তাদের সম্পর্ক থাকে তখন কেবল পশুর সম্পর্কের মতোই। যার কারণে তালাক ও বিচ্ছেদ, ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়া, এমনকি নিজের জীবন সঙ্গীর সঙ্গে খেয়ানতের মতো সর্বনাশা ঘটনাগুলোও অতি সহজেই প্রাত্যাহিক ঘটনার মতো সেখানে ঘটে থাকে। পিতা তার মেয়ের সঙ্গে ছেলেবন্ধুদের দেখে তাকে স্বাধীনতার প্রতি আরও উদ্বুদ্ধ করেন। ছেলের সঙ্গে

তার মেয়েবন্ধুদের দেখেও না দেখার ভান করেন। কারণ নাস্তিক্যবাদ তাদের শিক্ষা দিয়েছে, প্রত্যেকে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন চালাবে। প্রত্যেকে তার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সুতরাং অপরে কী করছে- সেটা দেখার দায়িত্ব তার নয়। আর এভাবেই পরিবারিক ব্যবস্থাকে সে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে।

পাঁচ. সমাজ ব্যবস্থার বিনাশ

আমরা আগেই বলে এসেছি, পরিবার হলো সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক উপকরণ। সুতরাং পরিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংসের ফলে সমাজ ব্যবস্থায়ও যে ধ্বংস ও বিলুপ্তি নেমে আসবে সেটা বলাই বাহুল্য। কেননা একটি পরিবার প্রতিনিয়ত সমাজকে নতুন নতুন সদস্য সরবরাহ করে। সুতরাং পরিবার যদি সমাজের কাছে নষ্ট ও বিপথগামী সদস্য সরবরাহ করে, তবে সন্দেহ নেই একসময় পুরো সমাজ নষ্ট ও বিপথগামী হয়ে পড়বে। একটি সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিই হয়ে থাকেন কোনো অফিসের সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা, হাসপাতালের চিকিৎসক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কিংবা শিল্প-কারখানার কর্মচারী। আর তাই সর্বত্রই এই মানুষটিকে তার আশ-পাশের মানুষের সঙ্গে সেভাবেই আচার-আচরণ করতে হয় যা ছোটবেলা থেকে তার পরিবার তাকে শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং ছোট বেলা থেকে পরিবারে সে যদি কেবল ব্যক্তিচিন্তা আর স্বার্থপরতা শিখে থাকে তবে সমাজেও তো সে ঠিক একইরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। ফলে গোটা সমাজটাই হয়ে পড়বে স্বার্থপর ও আত্মপরায়ণ সমাজ। পরস্পরের ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অনুভূতি, জনহিতৈষী মনোভাব, অপরের কল্যাণে নিজের স্বার্থকে কুরবান করে দেওয়ার মানসিকতা সেই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। সরকারি অফিস-আদালত, ব্যক্তি মালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হবে কেবল স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত গরজ পূরণের বাহন হিসেবে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই খুঁজতে থাকবে দুর্নীতি আর অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি। আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ আর রাষ্ট্রের সম্পদ নিজের বাপের রেখে যাওয়া মীরাস মনে করে চোখ বন্ধ করে গিলতে থাকবে।

নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে আমাদের আধুনিক মানব সমাজ ‘পশু’ সমাজের সঙ্গেই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেছে। যেখানের প্রত্যেকেই একে অপরকে শিকারের নেশায় সারাক্ষণ ওত পেতে থাকে। আর সে কারণে যেখানকার দুর্বলরা চায় সবলদের চোখ এড়িয়ে থাকতে। আর সবলরা চায় কলে-কৌশলে দুর্বলদের ঘাড় মটকাতে।

আজকের পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, অপরাধ সেখানে একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটা সেখানে মানুষের দৈনন্দিন গতানুগতিক আচারের অপরিহার্য অনুসঙ্গে রূপ নিয়েছে। সেকারণে, ব্যভিচার ও বিকৃত যৌনাচারের দরজা ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত থাকার পরেও সেখানে নারী অপহরণের হার রীতিমতো ভীতিকর। কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আর ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন পেশার মানুষ কর্তৃক চুরি-ডাকাতি আর সশস্ত্র ছিনতাই অহরহই ঘটছে। শহরগুলোতে শত শত অপরাধ সংঘটন আজ নিতান্তই একটা স্বাভাবিক চিত্র হয়ে গেছে।

এভাবেই আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ ও ভীতি থেকে উদাসীন নাস্তিক্যবাদী একটি সমাজ কখনো সুস্থ ও সবল সমাজ হিসেবে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারে না; বরং সেটা পরিণত হয় একটি অন্যায়, অশ্লীলতা, পাপাচার আর নীতিহীনতার ভাঁগাড়ে। অন্যায়-অপরাধ, জুলুম-নির্যাতন, আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি, অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে কাঙিক্ষত বস্তু অর্জন ইত্যাদি তখন হয়ে

পড়ে সেটার নিত্য-নৈমিত্তিক চিত্র। সেখানে সবলরা দুর্বলদের ওপর জুলুম করে। আর দুর্বলরা সবলদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য মুনাফেকির আশ্রয় নেয়। আর এগুলোই তখন পরিণত হয় সেই সমাজের মানুষের আচার-আচরণের মূলনীতি আর অলিখিত সংবিধানে।

ছয়. রাজনৈতিক অপরাধ

নাস্তিক্যবাদের প্রভাব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বিশ্ব রাজনীতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কারণ যেই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদী স্বভাব-চরিত্র একজন মানুষের হৃদয়কে কঠোরতা, রূঢ়তা আর আত্মপরায়ণতায় ভরপুর রাখে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটা তাকে কঠোরতা ও স্বার্থপরতার পথে ঠেলে দেয়। আর সে কারণেই আমরা পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সবসময়ই দেখি নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর কলা-কৌশল আর টাল-বাহানার আশ্রয় নিতে। উদ্দেশ্য থাকে, দুর্বল জাতিগুলোর গলায় গোলামির জিঞ্জির পরিয়ে দেওয়া, ছলে-বলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ধন-সম্পদ বাগিয়ে নেওয়া। এই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদী রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে আরব ও ইসলামী বিশ্ব। কারণ, যখনই কোনো আরব কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র নিজেদের হৃত অধিকার ফেরত চায়, তখনই তাদের সামরিক আগ্রাসনের নগ্ন হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। বরং আরও আগে বেড়ে বলা যায়, যখন আমাদের কোনো রাষ্ট্র নিজের সীমানার ভেতরে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোর পথে হাঁটার পরিকল্পনা করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ায়। পশ্চাৎপদ ও প্রগতিবিরোধী, অন্যায় ও বর্বর, জালেম ও অসহিষ্ণুসহ বিভিন্ন অপবাদ আর কলঙ্কের কালিমা লেপন করা হয় আমাদের পবিত্র ধর্মের সুশুভ্র

অঙ্গে। ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে এই নাস্তিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের মনে যে কতটা ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধহয় 'তেল'। যখন ইসলামী বিশ্ব এই তেলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে আবেদন করেছিল, তখন তথাকথিত এসব আন্তর্জাতিক মোড়ল আমাদের 'বিশ্ব অর্থনীতি ও সভ্যতা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। কারণ শুধু একটিই, আমরা কেন আমাদের ন্যায্য অধিকার চাইতে গিয়েছিলাম? বরং এসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বারবার হাঁক-ডাক ছেড়েছে, যদি তাদের কাছে তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয় কিংবা তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তবে প্রয়োজনে তারা আমাদের তেলের খনি দখল করে আমাদেরই এর থেকে মাহরূম রাখবে।

এভাবেই আজ গোটা পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক বস্তুবাদ ও স্বার্থপরতার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক তারা দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে দখল করে সেগুলোর ধন-সম্পদ লুট করছে। সেখানকার অধিবাসীদের গলায় গোলামির জিঞ্জির পরিয়েছে। আর সেগুলোকে ঠেলে দিয়েছে ভেদাভেদ, বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা আর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে।

বিশ্ব রাজনীতির কর্ণধারগণ যদি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হতেন, মহান স্রষ্টার ভয় যদি তাদের হৃদয়ে সদা-সর্বদা জাগরূক থাকতো, তবে এই পৃথিবীটা আজ এতটা অশান্ত থাকত না। জাতিতে জাতিতে থাকতো ভ্রাতৃত্ববোধ আর পরস্পরের সহমর্মিতা ও ভালোবাসার সুনিবিড় বন্ধন। দুর্বলদের সহায়তা, দরিদ্রদের অনুগ্রহ আর মজলুমের মমত্ববোধ- এসবই হতো বিশ্ব রাজনীতির মূল নীতিমালা।

কিন্তু এর চেয়েও বেশি ভয় আর আতঙ্কের বিষয় হলো আধুনিক যুদ্ধের হাতিয়ার ও সমরাস্ত্র আবিষ্কার। কারণ নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখন যে এই

নাস্তিক্যবাদী ও স্বার্থপর রাষ্ট্রগুলো গোটা পৃথিবীটা ধ্বংস করে দেয়- সেটা সম্ভবত কেউ-ই বলতে পারবে না।

ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করার জন্য আজ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যেসব পন্থা-পদ্ধতি এখতিয়ার করছে, তাতে কেউ বিস্মিত না হয়ে পারবে না। সমরাস্ত্রের পরিবর্তে আজ তারা ব্যবহার করছে মাদক, মিথ্যা প্রচারণা, নারী ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের হাতিয়ার। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য হিতকর সবকিছুই তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্ষুশূল।

এভাবেই নাস্তিক্যবাদ ও মহান আল্লাহ থেকে দূরাবস্থান একটি সুন্দর মানব সমাজকে পরিণত করে জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অনাচার, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-হানাহানিপূর্ণ একটি ঘৃণ্য সমাজে। ফুল ও পাখির গান নয়; সর্বদা সে সমাজে বয়ে চলে ধ্বংস আর বিনাশের তুফান। সেখানে মাদকের ভেতরে মানুষ বুঁদ হয়ে থাকে। ফুলে ওঠা আরক্তিম কামার্ত চোখে কামের নেশা দেখতে পায় পৃথিবীর সবকিছুতে। এভাবে নাস্তিক্যবাদের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা বিশ্ব রাজনীতি একজন মানুষকে বানিয়ে ফেলে চরম স্বার্থপর ও আত্মপরায়ণ। সে কেবল এই দুনিয়ার জন্যই বেঁচে থাকে। তার সামনে উপস্থিত দিনটিকেই পূর্ণ ভোগ করতে ভালোবাসে। ফলে সে মেশিনের মতো অহর্নিশ ঘুরতে থাকে। তার জীবন ভরে ওঠে হতাশা, বিশৃঙ্খলা আর অপরাধের অভিশাপে।

নাস্তিক্যবাদের তুফান প্রতিরোধ

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা দেখে এসেছি নাস্তিক্যবাদের পরিচয় ও এর বিকাশের কারণ কী ছিল? এরপর আমরা দেখেছি মানুষের হৃদয় ও মনে, পরিবার ও সমাজে, সর্বোপরি বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান পৃথিবীতে এর কতটা মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। এখন আমরা এই

সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজবো। এ ক্ষেত্রে গোড়াতেই আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে মানবতার ইহকালীন জীবনে শান্তি, সুখ ও সফলতা আর পরকালীন জীবনে জান্নাতে বসবাস নিশ্চিত করতে। আর সে কারণে ইসলাম মানব জীবনের এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা নাস্তিক্যবাদের তুফান প্রতিরোধের বহু পথ ও পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সেগুলোর ওপর আলোকপাত করবো:

এক. আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত :

ইসলামের দাওয়াতের ভিত্তিমূলই হলো আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা, গোটা সৃষ্টি জগতের একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া। আরও আগে বেড়ে বলা যায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল রাসূলের রিসালতের শুরু ও শেষ কথাই ছিল আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾ [النحل: ٣٦]

"আর আমরা প্রত্যেক উম্মতের কাছে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাগুতকে বর্জন করো।" [সূরা আন-নাহল: ৩৬] অন্যত্র আরও বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥]

"আর তারা এ ভিন্ন আদিষ্ট হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে দীনে তার প্রতি বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে, একনিষ্ঠভাবে, আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।" [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৫]

পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আর আমি মানুষ ও জিনকে- আমার ইবাদত করবে- এজন্য ছাড়া সৃষ্টি করি নি।” [সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬]

আর এভাবেই ইসলামী শরীয়তে মানুষের পৃথিবীতে অস্তিত্বের একমাত্র কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে এক আল্লাহর ইবাদত করা আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। এবিষয়টি নিয়ে ইসলামে কোনো অস্পষ্টতা রাখা হয় নি। ফলে আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্নভাবে মানুষের সামনে আপন অস্তিত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন যাতে করে মানুষের মনে এতটুকু সন্দেহ না থাকে। আল্লাহ তাআলা বিশাল আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ এগুলোর মাধ্যমে তার রবের স্তিঅস্তিত্বের সন্ধান লাভ করে। এজন্য তিনি মানুষকে নভোমন্ডল-ভূমন্ডল ও মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ভেবে দেখতে বলেছেন। আর তিনি মানুষকে এমন সব নির্দশন দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তাকে ঈমান ও সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করবে,

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلْءَافَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّۗ﴾ [فصلت: ٥٣]

“আমি অচিরেই তাদের দেখাবো আমার নিদর্শনাবলী দিগদিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও, যাতে করে তাদের সামনে স্পষ্ট যায় যে এটা ধ্রুবসত্য।” [সূরা ফুস্সিলাত: ৫৩]

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য কেবল সৃষ্টির মাঝে নিহিত তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শনাবলীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি; বরং নিজ একত্ববাদের সুস্পষ্ট আহ্বান নিয়ে যুগে যুগে মানুষের

কাছে প্রেরণ করেছেন পুণ্যাত্মা নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামদের। তারা এসে মানুষকে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একমাত্র প্রতিপালক ও ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি গোটা বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা। ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র রবও তিনিই। নবী-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান-কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারে। সর্বোত্তম পন্থায় তার ইবাদত ও আরাধনা করে। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি নিজ অস্তিত্বের সকল 'প্রমাণ' পূর্ণ করে দেন। অতঃপর সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য মানুষের জীবন-বিধান স্বরূপ নির্বাচিত করেন ইসলামকে। যাতে করে সালাত, সিয়াম ও হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতের মধ্য দিয়ে সদা-সর্বদা মানুষের মনে আল্লাহর স্তিঅস্তিত্বের বাস্তবতা চির জাগরূগ থাকে। মানুষ সবসময়ই নিজ রবকে একান্তই কাছে অনুভব করে। মূলত একারণেই ইসলামের সকল ইবাদতে একনিষ্ঠতা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিবেদনকে সাফল্যের মৌলিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ সন্দেহ নেই, একজন মানুষ যখন দিন-রাতের চব্বিশ ঘন্টায় আল্লাহর সামনে পাঁচবার সালাতের মাধ্যমে মাথা নত করবে, তখন বাকি সময়টাও তার মন ও মস্তিষ্ক আল্লাহর সমীপে অবনত থাকবে।

এভাবেই স্বীয় রবের সঙ্গে সান্নিধ্যের সুনিবিড় বন্ধন গড়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম একজন মানুষকে নাস্তিক্যবাদ থেকে মুক্ত রাখতে পারে। পারে মানুষ ও তাঁর রবের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এমন সবকিছু থেকে তাকে দূরে রাখতে।

দুই. চরিত্র গঠনের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ:

মানবতাকে কেবল তাওহীদের শিক্ষা দিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত থাকে নি; বরং পৃথিবীতে আদল ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠা, গোটা বিশ্ব মানবতার পর্থিব

জীবনের শান্তি ও সফলতা নিশ্চিত করার বিষয়টিও ইসলাম পরম গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। সে কারণে মুসলিমদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিজেরা কল্যাণ ও সফলতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন অন্যান্য মানুষকেও এর প্রতি আহ্বান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾ [ال عمران: ١٠٤]

“আর তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা চাই যারা আহ্বান করবে কল্যাণের প্রতি, নির্দেশ দিবে ন্যায়ের, আর নিষেধ করবে অন্যায় থেকে। আর তারাই হচ্ছে সফলকাম।” [সূরা আল-ইমরান: ১০৪]

অন্যত্র বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [ال عمران: ١١٠]

“তোমরাই মানবতার জন্য শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে উত্থিত হয়েছো- তোমরা ন্যায়ের পথে নির্দেশ দাও ও অন্যায় থেকে নিষেধ করো, আর আল্লাহতে বিশ্বাস রাখো। [সূরা আল-ইমরান: ১১০]

অতঃপর দাওয়াতের এপথে চলতে গিয়ে ধেয়ে আসা সকল বিপদ-আপদের মুখে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ধৈর্য ও সবরের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে বিমুখতার পথ বেছে না নেয়। পাশাপাশি নির্দেশ দিয়েছেন বিতর্কের ক্ষেত্রে যেন তারা হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করে। এভাবে মুমিনদের হৃদয় মানুষের মুহাব্বত ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকবে, সর্বদা তাদের শির্ক ও অবিশ্বাসের

অন্ধকার থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের আলোর পথে নিয়ে আসার চিন্তায় বিভোর থাকবে।

ইসলাম নিজ অনুসারীদের কাফের ও মুশরিকসহ পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে আদল ও ইনসাফ, দয়া ও করুণা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। দীন ও উম্মাহর কল্যাণ ও মঙ্গলের খাতিরে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আসা সকল যুলুম-নির্যাতনের ক্ষেত্রে সবর কিংবা বেশির থেকে বেশি হলে ইনসাফপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বলেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾ [البقرة: ١٩٠]

“আর আল্লাহর পথে তোমরা যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” [সূরা আল-বাক্বারা: ১৯০]

একইভাবে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ন্যায় ও ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨ ﴾ [المائدة: ٨]

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠাতা হও, ন্যায়-বিচারে সাক্ষ্যদাতা হও, আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন ন্যায়াচরণ না করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়াচরণ করো, এটিই হচ্ছে তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটতর। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিক-হাল।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৮]

মূলত ইসলাম গোটা মানবতার জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা ইসলামের নবীকেও ‘রহমতের নবী’ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমরা তো কেবল আপনাকে গোটা সৃষ্টিকুলের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।”[সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭]

এরপর ইসলাম মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও অভাবী মানুষের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিবেশীদের পরস্পরের ওপর বিভিন্ন অধিকার নির্ধারণ করেছে। বন্ধুর ওপর বন্ধুর অধিকার দিয়েছে। নিজের আশ-পাশের মানুষের অধিকারের কথাও বাদ রাখে নি। আরও আগে বেড়ে বলা যায়, পৃথিবীর সকল মুসলিমের একে অপরের ওপর বিভিন্ন অধিকার সাব্যস্ত করেছে। সালামের জবাব, হাঁচির উত্তর কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মাধ্যমেও এসব অধিকার পূর্ণ হয়ে থাকে। এসবের পাশাপাশি ইসলাম একজন মুসলিমকে অপর মুসলিমের ওপর জুলুম করতে নিষেধ করছে। কাউকে ঘৃণা বা অপমান করতে বারণ করেছে। তিনদিন কারও সঙ্গে কথা না বলে থাকতে নিষেধ করেছে। কারও দরাদরির ওপর দরাদরি, বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব করতে বারণ করেছে। অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-সমালোচনা থেকে দূরে থাকতে বলেছে। এগুলো অমান্যকারীর জন্য ঘোষণা করেছে কঠোর শাস্তি। এভাবেই ইসলাম পরিণত হয়েছে একটি পরিপূর্ণ মানবতার পয়গামে। যা এর অনুসারীকে সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে ন্যায় ও কল্যাণের বীজ বপনের নির্দেশ দেয়। জগতের প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে দয়া ও করুণার দীক্ষা দেয়।

মানবতার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের এসব দীক্ষা নিয়ে একজন সত্যিকার মুসলিম সহজাতভাবেই সম্পূর্ণ সুনির্মল ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী একজন সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। আর এগুলো করতে গিয়ে যখন সে সবসময় স্বীয় রবের ধ্যান ও খেয়াল হৃদয়ে জাগ্রত রাখবে, সন্দেহ নেই কুফর, অবিশ্বাস আর নাস্তিক্যবাদ থেকে সে অনেক দূরে থাকবে। পরিণত হবে মহান প্রভুর নিতান্ত কাছের একজন মানুষে।

এভাবে ইসলামের সঠিক চর্চার মাধ্যমে একজন মুসলিম হয়ে ওঠে ভূপৃষ্ঠের ওপর চলমান সবার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧ ﴾ [البينة: ٧]

“নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম।” [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৭]

পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হতে পারি যে, পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের অন্যতম দু'টি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো: নিষ্ঠা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁর ইবাদতে আত্মনিবেদন করা এবং গোটা মানবতার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কাজ করা। অথচ নাস্তিক্যবাদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে গোটা পৃথিবীতে কেবল অশান্তি আর নৈরাজ্য সৃষ্টি করতেই অধিকতর সিদ্ধহস্ত।

তিন. নাস্তিক্যবাদের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা:

কুফর ও অবিশ্বাস হলো বাস্তবতাবিবর্জিত ও অন্তঃসারশূন্য একটি মতবাদ। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বে অস্বীকার, পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নামে অবিশ্বাস, নবী-রাসূলগণের রিসালতের ওপর অনাস্থা সম্পর্কে একজন মানুষ

মুখে মুখে শত তর্ক করলেও হৃদয় ও মনোজগতে সে কখনোই পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর সেকারণে একজন অবিশ্বাসীর কাছে ‘অজ্ঞতা’ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। সে যা জানে না, সেটাই সত্য বলে মানবে না- এটাই তার কাছে পৃথিবীর সবকিছু বিচার-বিবেচনার মাপকাঠি। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলতে কাউকে আমি দেখি না বা চিনি না। পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না- এসব ‘অজ্ঞতা’ আর ‘অনুমান’ হচ্ছে তার দর্শনের মূল ভিত্তি। অথচ তার এটাও জানা নেই যে, ‘অজ্ঞতা’ ও ‘অনুমান’ কখনো বিচারের মানদণ্ড হতে পারে না।

কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের মূল কারণ কিন্তু এটা নয় যে, আল্লাহর অস্তিত্বের নির্দশনাবলী তাদের চোখে পড়ে না; বরং গোপন কিছু স্বার্থসিদ্ধি আর গরজ হাসিলের জন্য তারা অবিশ্বাসের পথ বেছে নেয়। কারণ তাদের খুব ভালো করে জানা আছে, ঈমান ও বিশ্বাসের পথ বেছে নিলে সেটা তাদের কুপ্রবৃত্তির নিমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। স্বেচ্ছাচারিতার সব দুয়ার বন্ধ করে দিবে। তখন যথেচ্ছভাবে জীবন ও যিন্দিগির পথে হাঁটা যাবে না। যা কিছু ভালো লাগে তা-ই করতে হবে এমন সুযোগ থাকবে না। আর এগুলিই মূলত যুগে যুগে কাফির ও অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস থেকে বিমুখতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে মূল নিয়ামকের কাজ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ﴾ [النجم: ٢٣]

“তারা তো শুধু অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তি যা কামনা করে তারই অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রভুর কাছ থেকে অবশ্যই তাদের নিকট পথনির্দেশ এসেছে।” [সূরা আন-নাজম: ২৩]

সুতরাং একজন অবিশ্বাসী কখনোই আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত হতে পারে না। কেননা একজন অবিশ্বাসীর কাছে 'অজ্ঞতা' আর 'অনুমান' ব্যতীত অবিশ্বাসের কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে না। যেমন না আছে তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জগতের সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের মিথ্যা হওয়ার কোনো প্রমাণ; আর না আছে কোনো দলীল যে, নবী-রাসূলগণ অসত্যের দাওয়াত দিয়েছেন এবং লোকদের আহ্বান করেছেন কল্পিত জান্নাত-জাহান্নামের দিকে; অথচ বাস্তব চিত্র পুরোটাই ভিন্ন। ঠিক তেমনিভাবে না কোনো অবিশ্বাসী সদুত্তর দিতে পারে দাওয়াত ও হিদায়াতের পথে নবী-রাসূলগণের অবর্ণনীয় জুলুম ও লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করার রহস্য সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে আমরা আগেই বলেছি, একজন কাফিরের কাছে তার কুফরের মূলভিত্তিই হচ্ছে 'অজ্ঞতা'। আর 'অজ্ঞতা' ভালো-মন্দ কিংবা সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি হতে পারে না।

কিন্তু কোনো কিছু কেবল সত্য বলেই দুনিয়ার সকল মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে- এমন কোনো মূলনীতি নেই। বরং সত্য ও বাস্তবসম্মত হওয়ার পরেও বাস্তবতাকে জগতবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। মানুষের চোখের সামনে প্রমাণ দিতে হবে স্বীয় বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতার। তবেই মানুষ তাকে বাহু প্রসারিত করে বুকে তুলে নিবে। একইভাবে কোনো কিছু মিথ্যা হওয়ার কারণেই মানুষ তাকে ঘৃণাভরে পরিহার করবে- এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং মিথ্যা ও অসুন্দর কখনো কখনো সত্য ও সুন্দরের আবরণে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে মন ও মগজ আচ্ছন্ন করে নেয়। আর তখন মানুষও সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যাকেই ভালোবাসতে থাকে। আর এটা অধিকাংশ সময়ই হয়ে থাকে সত্যের অনুপস্থিতিতে কিংবা সত্যের পক্ষের লোকদের দুর্বলতা, গাফলতী ও উদাসীনতার সুযোগে। মানুষের সামনে মিথ্যার গোমর ফাঁস করা ও নাস্তিকদের

দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত লোকের অভাবে। আমাদের পার্থিব জীবনেও এটার ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে। বাপ-দাদা থেকে ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া সম্পত্তিও অনেক সময় ওয়ারিসের দুর্বলতা ও উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী ও ধুরন্ধর শত্রু দখল করে নেয়। অথচ জমির মালিকই সত্যের ওপর আর বিপরীত পক্ষ মিথ্যার ওপর। কিন্তু মিথ্যাবাদী তার মিথ্যার ওপর সত্যতা ও দলীল-প্রমাণের এমন নিশ্ছিদ্র আবরণ তুলে দেয় যে, বিচারক সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হন। কারণ মানুষকে পৃথিবীতে চোখের দেখা ও সামনে উপস্থিত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বিচার করতে হয়। আর মূলত সেই একই কারণে আজ আমাদের সত্যের পক্ষের লোকেরা হকের ওপর হওয়া সত্ত্বেও অবিশ্বাসী আর নাস্তিক্যবাদের সামনে অসহায়। যেন পৃথিবীর সব দুর্বলতা আর জড়তা তাদেরকে পেয়ে বসেছে। অথচ তাদের দুশমন নিয়ত উদ্যম আর উন্নতির পথে অবিরাম হাঁটছে। আর মূলত এভাবেই নাস্তিক্যবাদও গোটা পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। যদিও মিথ্যা কখনো মানুষকে মানসিক পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। তথাপিও মিথ্যার ওপর যখন সত্যের প্রলেপ দিয়ে সেটাকে ঢেকে ফেলা হয়, তখন মানুষের হৃদয় ও মন খুব সহজেই সেটা গ্রহণ করে নেয়।

নাস্তিক্যবাদের প্রতি মানুষের আগ্রহের আরও একটি কারণ হলো এর ভেতরের আযাদ যিন্দিগির হাতছানি। কারণ নাস্তিক্যবাদ এর অনুসারীর জন্য পৃথিবীর সবকিছু হালাল ও বৈধ ঘোষণা করে। তার মন যা চায় তা-ই সে করতে পারবে- তাকে এমন স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি ও নিশ্চয়তা প্রদান করে। অথচ এর বিপরীতে ঈমান মানুষের সামনে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার রেখা টেনে দেয়। এটা তাকে বলে দেয়, তুমি এটা করতে পারবে, আর ওটা করতে পারবে না। পাশাপাশি ঈমান মানুষকে পরকালে সুখের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়।

পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদ মানুষকে এই জীবনেই স্বর্গ-সুখের মিথ্যা স্বপ্ন দেখায়। আর যেহেতু মানুষ সহজাতভাবেই বাকির ওপর নগদকে অগ্রাধিকার দিতে অভ্যস্ত। তাই সে খুব সহজেই নাস্তিক্যবাদ ও অবিশ্বাসের পথে হাঁটতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক করে তোলে সত্যের পথে আহ্বানকারীদের ক্ষমাহীন অক্ষমতা ও দুর্বলতা। কারণ তারা মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয় যে, পরকালের সুখই মূলত প্রকৃত সুখ। অবিশ্বাসীরা যে পার্থিব জীবনের সুখ-স্বর্গের স্বপ্ন দেখায় তা মূলত অশান্তির কারাগার। আর এই বোধশক্তি ও সচেতনতাটুকু মানুষের ভেতর জাগ্রত করে না দিতে পারার কারণে নাস্তিক্যবাদের অন্ধকারের সামনে তাওহীদের আলো ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান হয়ে নিবে যাওয়ার উপক্রম হয়।

‘বাগ-যুদ্ধ’ ও যুক্তিতর্কই একমাত্র সমাধান নয়

পেছনের আলোচনা দ্বারা কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, কেবল ‘যুক্তি-তর্ক’, ‘বাকযুদ্ধ’ আর ‘দলীল-প্রমাণ’ এর মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার রোধ করবো। কারণ ইসলাম ও তাওহীদ নিছক কোনো মৌখিক শব্দমালার নাম নয়; বরং এটি জীবনের ময়দানে বাস্তব প্রয়োগের নাম। আর তাই ইসলামের সত্যতার প্রমাণ কেবল মুখে নয়; কাজের মাধ্যমেও দেওয়া অপরিহার্য। উদাহরণত, কেউ ইসলামকে ‘পশ্চাৎপদ’ ও ‘প্রগতিবিরোধী’ বলে অপবাদ দিলো। তাহলে এই অপবাদের দাঁত-ভাঙা জবাব দিতে হবে মুসলিমদের শক্তিশালী, উন্নত ও ‘সুস্থ’ প্রগতির ধারক-বাহক হওয়ার মধ্য দিয়ে। একইভাবে কেউ যদি বলে যে, ইসলাম আধুনিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে এই অভিযোগ পরিপূর্ণ অর্থে খণ্ডন করতে হলে জীবনের

ময়দানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এভাবেই পৃথিবীতে সত্য সত্যরূপে আর মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রকাশ পাবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিক যুগের নাস্তিক্যবাদ মুকাবিলা করতে হলে আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কেবল কথা-বার্তা, যুক্তি-তর্ক আর বই-পুস্তক দিয়ে নয়; জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ও উপযোগী বলে প্রমাণ করতে হবে। নতুবা এই যুদ্ধে আমাদের জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।

নাস্তিক্যবাদের কথার জবাব যেমন মুখে দিতে হবে। তেমনি কাজের জবাব কাজের মাধ্যমেই দিতে হবে। সমাজে নাস্তিক্যবাদ যদি বিকৃতি, বিশৃঙ্খলা, ভঙ্গুরতা ও আবিলতার অন্ধকার জন্ম দেয়, তবে তাওহীদের সেখানে সুস্থতা, শৃঙ্খলা, স্থিতি ও নির্মলতার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। একইভাবে নাস্তিক্যবাদের প্রকাশ যদি হয় জুলুমের দ্বারা, তবে তাওহীদের প্রকাশ ঘটাতে হবে অর্থ হতে হবে ইনসাফের মাধ্যমে। একইভাবে ইসলামের পতাকাবাহীরা যদি এই দাবি করেন যে, ইসলাম হলো পৃথিবীর একমাত্র বাস্তবসম্মত দীন ও প্রকৃত সফলতার পথ, তবে কেবল চেঁচামেচি না করে ইসলামের বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সত্যিকারার্থে সুখী ও আদর্শ সমাজ পৃথিবীকে উপহার দিয়ে দাবির যথার্থতা ও ন্যায্যতার প্রমাণ দিতে হবে।

এভাবেই যদি আজকের মুসলিম জাতি নাস্তিক্যবাদের সকল সন্দেহের জবাব দিতে সক্ষম হয়, কেবল কথার পরিবর্তে কাজের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর আস্থার জায়গাটুকু অধিকার করে নেয়, তবে একদিন না একদিন অবশ্যই আমাদের পৃথিবী থেকে নাস্তিক্যবাদ উন্মূলিত হবে। বিশ্বাসের ফুল বাগান অবিশ্বাসের হুতোম পেঁচা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পাবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সহায় হোন। আমীন।